শুরুতেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা ও জীবনসাধনা অপৃথক। এই দুই আবার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনার পালা।'

একথা শুধু তাঁর কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র রচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অসীমকে তো আর ধরা-ছোঁয়া যায় না, তা সম্ভব হয় তাকে সীমার মধ্যে টেনে নিলে। তাতে সীমা-অসীমের সংযোগ ঘটানো যায়। তখন সীমা অসীমের ছোঁয়ার পায় অনন্তের ব্যঞ্জনা, রূপের মধ্যে অরূপের লীলা সংঘটিত হয়। রূপসাগরে ডুব দিয়ে অপরূপরতনকে লাভ করা যায়। পরম যে এক তিনি অসীম, সৌন্দর্যেরও চরম। অসীমের ও সুন্দরের উপলব্ধি সেই পরম একেরই উপলব্ধি। প্রত্যক্ষ জগৎ-সংসার রূপময়। আর তাকে অবলম্বন করেই পরম সুন্দরের অভিব্যক্তি। অসীম-অনন্তকে বুঝতে হলে রূপ অর্থাৎ জগৎ-সংসারকে বর্জন করলে চলবে না, তাকে গ্রহণ করেই অসীম-অনন্তকে বুঝতে হবে।

'এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।'

পরম একেকে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসংসারকে উপেক্ষা করা চলবে না। জড়প্রকৃতি জীব এবং সুখদুঃখ স্নেহপ্রীতি আশা-আনন্দ-তরঙ্গিত জীবনকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি জড়ের প্রতীক নয়, সেও প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত, সেও আনন্দময় চৈতন্যময় সত্তার স্বতঃপ্রকাশ।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী আদর্শবাদী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ভাববাদ বা আদর্শবাদ জীবনবাদেরই অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে শুধু স্থূল জীবসত্তা রূপে দেখেননি, বরং তাকে আনন্দরূপ চৈতন্যরূপ ভাবসত্তায়-ও দেখতে চেয়েছেন। জ্ঞান-কর্ম-ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশই তাঁর চোখে সমুন্নত মনুষ্যরূপ। এ-দেখায় আদর্শবাদ বা ভাববাদ স্পর্শ করেছে বৈকি।

রবীন্দ্রনাথের মানসিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনে ঔপনিষদিক আদর্শবাদের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে সংলক্ষ্য অবশ্যই কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি— জ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য, সমন্বয়বাদী লোকায়ত ধর্মদর্শন, বৈষ্ণব-সুফি ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শন, বৈষ্ণবধর্মের প্রেম-ভাবনা, বাউল-মুরশেদের মরমিয়াবাদ, বাংলার মধ্যযুগের লোকসাহিত্য-লোকগীতের উদার জীবনবাদ, পরবর্তী অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য শিল্প ও দর্শনের চিন্তা-ভাবনার অবদানও অল্প নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার এক মৌল বৈশিষ্ট্য— তাঁর স্বকীয় রুচি ও আদর্শের অনুকূল,— তাঁর চেতনা ও মস্তিষ্কের প্রকর্ষে সহায়ক এমন বহু ভাব-চিন্তা-উপাদান তিনি আশ্চর্য রাসায়নিক যৌগের দ্বারা আত্মীকরণ করে নিয়েছেন, স্বীকরণ করে নিয়েছেন। বাস্তব জগৎ-সংসার ও জীবনকে তিনি দেখেছেন প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে— জগদাতীত ঐশ্বর্য-মাহাত্ম্যে বিধৌত করে নিয়ে। ফলে তাঁর জীবনদর্শন দেশকালের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তা বিশ্বগত হয়ে গেছে। এই ব্যাপক ও গভীর জীবনদৃষ্টিতে সুখদুঃখ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি-ধ্বংস সমস্তকিছুর মধ্যে এক আশ্চর্য প্রবহমাণ ঐক্য-সূত্র ও ছন্দ ধরা পড়েছে, এবং সবকিছুকে অতিক্রম করে সত্য-শিব-সুন্দরের শাশ্বত রূপ— চিরায়ত বাণী তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে চিরন্তন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ণদৃষ্টি যেমন তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে, তেমনি সাহিত্যের তত্ত্ব-নির্ধারণে, এমনকি সাহিত্য-সমালোচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মহান কবি, মহান স্রষ্টা, মহাকবি। সুতরাং সাহিত্য-বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধারণ সমালোচকের ধ্যান-ধারণা নয়। অনেক সময় সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যর্থ, অসফল ব্যক্তিকে সাহিত্য-আলোচনায় ব্রতী হতে দেখা যায়। আবার, অনেক পণ্ডিত-মনস্বী ব্যক্তি সাহিত্য-আলোচনায় বৃত হন। কিন্তু সকলে যেমন মহাকবির প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন না, তেমনি সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও সবসময় প্রতিভাবান ব্যক্তি লেখনী ধরে থাকেন এমনটাও সচরাচর ঘটে না। যদি প্রতিভাবান স্রষ্টা ও সমালোচক অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহলে সমালোচনার মান যে সর্বোৎকৃষ্ট হবে এ তো সহজেই বলে দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুর্লভ ও বিরল ঘটনাটিই ঘটতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ নিজে মহান স্রষ্টা, আবার সমালোচকও। ফলে তাঁর সমালোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা যে উৎকর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারে একজন সাধারণ সমালোচক, বা নিজেস্রষ্টা নন— শুধুই সমালোচক এমন ব্যক্তির সমালোচনার মান সেই উৎকর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন হয়। সকলে যেমন বড় কবি বা লেখক হতে পারেন না তেমনি সকলেই বড় সমালোচকও হতে পারেন না।

'সাহিত্য বিচারক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> 'যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন গ্রহণ করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে; এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে।'

'পরখ করিবার শক্তি' সাধারণ সমালোচকের থাকে না, একমাত্র প্রতিভাবান সমালোচক এর অধিকার লাভ করেন। কবি বা লেখক যে-শক্তি দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন সে-শক্তির যিনি অধিকারী নন তাঁর পক্ষে সাহিত্যের যথার্থ বিচার সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে মহাকবি, মহান স্রষ্টা। আবার তিনি মহান সমালোচক। শুধু বুদ্ধি বা মেধা, পাণ্ডিত্য বা পাঠৈষণা, যুক্তি-শৃঙ্খলা নয়, এসবের সঙ্গে গভীর মনন, উচ্চকোটির কল্পনা, মৌলিক সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি, দুরবগাহ জীবনবোধ এবং গভীর রসোপলব্ধি, সেই সঙ্গে আবেগময় কবিত্বমণ্ডিত ভাষা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রে বিদেশে এবং এদেশে দুটি ভিন্ন রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। একটি হল বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ অথবা বিশ্লেষণধর্মী ও সংশ্লেষধর্মী। দ্বিতীয় রীতিটি হল ব্যাখ্যামূলক ও সৃষ্টিধর্মী। বস্তুধর্মী বা বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সাহিত্যকর্মের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, সমালোচক বিশ্লিষ্টভাবে সাহিত্যগ্রন্থের বিষয়, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেন এবং যুক্তি-তথ্য-তত্ত্বের সাহায্যে নিজের বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশে যত্নবান হন। আত্মনিষ্ঠ বা সংশ্লেষধর্মী পদ্ধতিতে সাহিত্যের সামগ্রিক গুণাগুণ বিচার করা হয় সমালোচকের নিজস্ব ভাল-লাগা মন্দ-লাগার নিরিখে। রবীন্দ্রনাথ এ-ধরনের সমালোচনায় বিশ্বাসী নন। তিনি ব্যাখ্যামূলক বা সৃষ্টিধর্মী আলোচনায় শ্রদ্ধাশীল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কী সংগ্রহ করার জন্য বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান অংশগুলিও আমি বলি,

সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, শিল্পকলার বিচার কোনো শিল্পকর্মকে ভেঙে, আলাদা করে নিয়ে, তার অংশগুলোর বিচার নয়। তাজমহলকে ভেঙে তার প্রস্তরখণ্ডগুলোকে আলাদা করে নিয়ে সৌন্দর্য-বিচার করলে কোনো লাভ হবে না। তার অখণ্ড রূপেরই সৌন্দর্য-বিচার করতে হবে। কেননা, বিশ্লিষ্ট খণ্ডগুলোকে পরে জোড়া দিয়ে নতুন আর একটি তাজমহল গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তিনি বলেছেন—

> 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়।'

উদ্ধৃত অংশটির 'এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়' কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবি-সাহিত্যিক তাঁর রচনায় যে-অনুভূতি প্রকাশ করেন বা যে-চরিত্র সৃষ্টি করেন তা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের মানসিক গঠন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্‌বোধন ঘটায়, ভিন্ন রসাবেদন সৃষ্টি করে। রসিক পাঠক নিজের হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করে পঠিত সাহিত্যের ভাব সৃষ্টি করে নেন নিজের মতো করে। সাহিত্য-সমালোচকও একজন পাঠক। সমালোচ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁরও যে মানসযোগ থাকে না তা নয়, তবে সমালোচকের মনে ভিন্ন অর্থ-তাৎপর্যেরও উপলব্ধিও ঘটতে পারে। সৃষ্টিধর্মী সমালোচনায় এরকমটাই ঘটা স্বাভাবিক। কোনো সাহিত্যগ্রন্থ পাঠে নিজের মানস-দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মস্বরূপ সমালোচকের মনে যে অনুভূতি বা উপলব্ধি জাগায় তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে থাকেন, যা অভিনব এক সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা।' অন্যত্র বলেছেন—

> 'কোন্ কবির কল্পনা মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপনার অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল তাহাই সাহিত্য সমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।'

এক্ষেত্রে সেই সমালোচককে কল্পনা অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হতে হয়। এককথায় প্রকৃত শিল্পীজনোচিত রসবোধ এবং রসানুভূতি সেই সমালোচকের থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনায় এই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির প্রসঙ্গ স্মরণ করতে পারি। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য অথবা 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' নাটক দুটির আলোচনা স্মরণ করতে পারি। কালিদাসের ওই রচনা দুটির যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তা কালিদাসের চিন্তা-ভাবনা কিনা জানার উপায় নেই, কিন্তু পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় এ-ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক। এক মহাকবির সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে আর এক মহাকবি যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অভিনব সৃষ্টি হয়ে দাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে নিজের চিত্তরসে সঞ্জীবিত করে তাকে নতুন রূপ দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, ভাব-ভাবনা, শিল্পবোধ ও শিল্পরুচি, তার সঙ্গে কবিত্বময়-ব্যঞ্জনাময় ভাষা, উপমাদির প্রয়োগ সব মিলিয়ে এক অভিনব-কালিদাস নবজন্ম গ্রহণ করেছেন। গভীর মনন,

উচ্চশ্রেণীর শিল্পচেতনা ও নিবিড় রসোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনায় সর্বত্র পরিস্ফুট।

একালে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যামূলক সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি অনেকের কাছে মানা মনে না-হতে পারে। কবিত্বমণ্ডিত ভাষা ও উপমাপ্রয়োগের বাহুল্যও সাহিত্য-সমালোচনায় গ্রাহ্য হবে না। বারংবার একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, মন্তব্য অনেকে বাহুল্য বলে মনে করতে পারেন। হয়তো পাঠকের বিচারবুদ্ধির ওপর তিনি যথেষ্ট ভরসা করতে পারেন নি। বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে (যথা : সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য ও সৌন্দর্য ইত্যাদি) ব্যঞ্জনা, রস, সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রকাশ ইত্যাকার প্রসঙ্গে বড়বেশি পুনরুক্তি করেছেন, অযথা উপমা ব্যবহার করেছেন। আসলে উল্লিখিত বিষয়গুলি পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত যে একের কথা বলতে গিয়ে অন্যের কথা এসে গেছে। তার ফলে অনেক সময়ই একটি প্রবন্ধ থেকে আর একটি প্রবন্ধের পার্থক্য পর্যন্ত বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

সাহিত্যতত্ত্ব-আলোচক রবীন্দ্রনাথকে আমরা পূর্বাহ্ণেই আদর্শবাদী, আনন্দবাদী, আধ্যাত্মিকতাবাদী এসব বলেছি। রোমান্টিত তো বটেই। রোমান্টিকতা থেকে যাত্রা শুরু করে যে সুদূরাভিসার সে তো অনন্ত-অসীমের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হবে। হয়েছেও তাই। সাহিত্য-তাত্ত্বিক বা সাহিত্য-সমালোচক শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতাবাদী, এবং সাহিত্য তাঁর কাছে 'দৈববাণী' হিসেবেই গ্রাহ্য হয়েছে। বস্তুবাদী সাহিত্য-তাত্ত্বিক এবং সমালোচকদের হয়তো এখানেই আপত্তি। বস্তুভূমি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ বীণার তারে সুর চড়াতে চড়াতে তাকে একেবারে আধ্যাত্মিকতার স্তরে তুলে নিয়ে গেছেন। অবশ্য এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা ঠিক হবে না, অথবা এরকম অভিযোগও হয়তো সঠিক নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো অনেক great poet মনে করতেন, এখন হয়তো সে-রকম কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে— যে, শিল্প সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ অতীন্দ্রিয়বাদ বা আধ্যাত্মিকতাবাদে। একালের একজন বড় কবি টি. এস. এলিয়টও তাই মনে করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-ঘটিত প্রবন্ধের সমালোচনা করে মোহিতলাল মজুমদার যে মন্তব্য করেছেন, একালের অনেক সাহিত্যতত্ত্ববোদ্ধা ও আলোচক-প্রাবন্ধিক হয়তো সেই কথা বলতে চান।

> 'রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ধর্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাহিত্যপ্রকৃতির আলোচনা করেন নাই। কিন্তু কেবলমাত্র Aesthetics বা রসতত্ত্বের মূলসূত্রটির আলোচনা করিলে সাহিত্যের বহিরঙ্গটি অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। যে বাস্তব আমি সকল সাহিত্য-কীর্তির মূলভিত্তি বলিয়াছি, যাহার সঙ্গে দেহ-মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে, পূর্ণ প্রেরণা-সঞ্চার হয় না, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একেবারে রসতত্ত্বে আরোহণ করিলে দেহধর্মী মন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে।'

৩

সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব— গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং তাঁর শিষ্য আরিস্টটলের সাহিত্য-বিচিন্তা অনেক বাস্তববাদী সাহিত্য-বোদ্ধাকে প্ররোচিত করে। রবীন্দ্রনাথও যে এ-ধারণার বিরোধিতা করেন তা কিন্তু নয়। তবে গ্রিক দার্শনিকদ্বয়ের কথিত 'জীবন' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অনেক ব্যাপক ও গভীর, অতলান্তও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন প্রাত্যহিকতায় ক্লিষ্ট জীবন নয়। সে জীবনের সঙ্গে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্যে সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-নিষিক্ত জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। যদি রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্যবোধ তত্ত্ব বলে ধরে নিই, তাহলে এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'সহিতত্ত্ব' বা 'মিলন-তত্ত্ব'। মানুষ জীববৃত্তির দায়ে

বৈষয়িক সমৃদ্ধির পিছনে ছোটে। শুধু জীবন-ধারণ এবং বাঁচার তাগিদে সে এই কাজটি করে। কিন্তু এছাড়াও মানুষের আরও একটি অন্তরগাহ্য আকাঙ্ক্ষা থাকে— তা হল, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা। 'সাহিত্যের পথে' থেকে একটু অংশ তুলে দিই—

> 'ভর্তৃহরি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশু-পক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপনার জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে— সাহিত্য তারি একটি বড়ো পথ।'

নিজের স্বার্থ ভুলে বিশ্বের সঙ্গে সহিতত্ব বা যোগস্থাপনের চেষ্টা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। এর সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের লীলাবাদের যোগ আছে। লীলাময় স্রষ্টা অর্থাৎ পরম এক বহু হতে চাইলেন, নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজের আনন্দ-স্বরূপকে আস্বাদন করতে চাইলেন— 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা/আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা'। সাহিত্যের মধ্যেও এই লীলাই সংঘটিত হয়ে থাকে। যিনি সাহিত্যের স্রষ্টা তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে নিজের আনন্দস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চান, উপলব্ধি করতে চান। বিশ্বের সঙ্গে নিজের মনের মিলন ঘটানোই স্রষ্টার কাজ, এবং তিনি তা সম্পন্ন করেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। 'সাহিত্যের পথে' থেকে আবার একটু অংশ তুলে দিই—

> বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি, এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয়, তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোরম করে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ।'

এই মিলন-তত্ত্ব অধিগত হলে সাহিত্যের সঙ্গে সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য ইত্যাদি তত্ত্বগুলির সৌন্দর্য বুঝতে পারা যায়। সমগ্র বিশ্বচরাচরে যে মূল তত্ত্বটি বিরাজমান সেটিই আত্মা। বাইরের সমস্ত-কিছুকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে স্ব-আত্মার প্রকাশ এবং বিশ্বের সমস্ত-কিছু আত্মার আত্মীয় বলে জানা— এভাবে দেখাই যথার্থ দেখা,এবং এভাবে জানাই যথার্থ জানা। আত্মা যখন সমস্ত পার্থিব কামনাবাসনা বা স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করে আত্মস্থ হয়, তখনই বিশ্বচরাচরের সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগটি তার কাছে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। সকল বিশ্বকে নিজের মধ্যে লাভ করে তখন সে বৃহৎ এবং মহৎ সত্তার অধিকারী হয়,— আর তখনই সে বস্তুর সত্যকার রূপটি দেখতে পায় অর্থাৎ তার আত্মোপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গলের বোধ জাগ্রত হয়। তাতে যে আনন্দ লাভ হয় তার থেকে সাহিত্যসৃষ্টি। রবীন্দ্র-সাহিত্য-দর্শনে এই যে সাহিতত্ব বা মিলন-তত্ত্ব তার মূলে আছে আত্মার ঐক্যতত্ত্ব।

৪

বাইরের জগৎ কবির মধ্যে এক অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে। কবি-সাহিত্যিকরা বাইরের জগতের ভাবকে নিজের মনের মধ্যে আহরণ করেন। তারপর সেই ভাবকে নিজের রসচেতনায় সিক্ত করে নিজের কালের এবং সকল কালের উপযোগী করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তা নহে— তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখদুঃখ জড়িত— তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।'

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন—

'সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোনখানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়।'

মানুষ সতত নিজের পশুপ্রকৃতিকে অতিক্রম করে একটি উচ্চ গৌরবময় আদর্শ অনুসরণ করতে চায়— সেইটিই তার যথার্থ প্রকৃতি। তার ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা দীনতা-হীনতা এসমস্তই অসত্য। সাহিত্যে মানুষের আদর্শ রূপটিই প্রকাশলাভ করে।

'সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'.... মানুষের যাহা কিছু বড়ো, যাহা কিছু নিত্য, যাহা সে কাজেকর্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারেনা, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনি মানুষের বিরাট রূপকেই গড়িয়া তুলে।'

'বস্তুত প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়া-তাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে।'

শিল্পে, সাহিত্যে মানুষের বাস্তবসত্তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, মানুষ যা হতে পারে, হতে চেষ্টা করে সেই আদর্শরূপই প্রকৃত সত্য। জান্তব প্রকৃতি বাস্তব কিন্তু তাকে অতিক্রম করে নিজেকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাই প্রকৃত মানব-আদর্শ। শিল্পে-সাহিত্যে আদর্শ সেই আদর্শায়িত মানবেরই আদর্শ। সৎ-সাহিত্যের অর্থ সুসাহিত্য। কোনোরকম শিক্ষা— যথা, নীতিশিক্ষা তার লক্ষ্য নয়। মানবতার যে ধ্রুব আদর্শ সাহিত্যে পরিস্ফুট হয় তার প্রভাব নীতিশিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

৫

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ খুব সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে বলেছেন—

'মানব-প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ— তারই প্রতি লক্ষ্য মানব-বিজ্ঞানের,আর ব্যক্তি-বিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের।'

বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক। যেটা যেভাবে রয়েছে তাকে সেভাবে দেখা বিজ্ঞানের প্রকৃতি— তার মধ্যে ব্যক্তির ভাব বা অনুভূতির কোনো জায়গা নেই। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে বিজ্ঞানীর সাধনা। তাঁর সাধনার বিষয় থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত রাখতে সদাতৎপর। সাহিত্যে তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। সাহিত্যকার নিজের রচনার বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বিষয়ের ওপর পড়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ। সাহিত্যের যে জগৎ, তা সাহিত্যকারের নিজের দৃষ্টিতে-দেখা জগৎ— মানসিক জগৎ। প্রকৃতিকে মানবীয় করে নিয়ে সাহিত্যকার তাকেই

সাহিত্যে প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে দেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেখার কোনো চেষ্টা সেখানে করা হয় না। সাহিত্যে মানবের ভাবজগতের প্রকাশ— বিজ্ঞানে জ্ঞানের জগতের। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'জ্ঞানে পাই বিষয়কে, কিন্তু ভাবে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীকেই অধিক করিয়া লাভ করি।' বিষয় ও বিষয়ীর ওতপ্রোত মিলনে সাহিত্যের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অনুভূতি বা কল্পনাশক্তিকে যে গুরুত্ব দেন কোনোপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই গুরুত্ব দেওয়ার তিনি বিরোধী। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মিলনে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করতে তিনি আদৌ রাজি নন, তিনি মনে করেন— এর দ্বারা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাহিত্যের নিত্যতা ও সর্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল্য অল্পকালেই হ্রাস পায়, তাতে তার আবেদনও ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। শুধু সাহিত্যে কেন, সাহিত্য-বিচারেও বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ তিনি অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। সাহিত্য-বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি— যা মনোবিজ্ঞানের অবদান— রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় মনে করেননি। তিনি মনে করতেন, বিশ্লেষণের দ্বারা সমগ্রের মূল্যায়ন হয় না।

> 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সে রকম বিচারের শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।'

সাহিত্য-বিচারের একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল মূল্যায়নের রীতি— যা পদার্থ-বিজ্ঞানে আছে— রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি।

> 'সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় আবার স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য-পরিবর্তমান পরিমাণ-বৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য; আর কোনো উপায় নেই।'

সাহিত্য-বিচারে পাঠক বা সাহিত্য-বিচারকের ব্যক্তিগত রুচিকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন— 'সাহিত্যের পরিমাপ সাহিত্য দিয়ে' করতে উৎসাহ দিয়েছেন। একালে বিজ্ঞানের প্রভাবে সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। কল্লোল-যুগের সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের দোহাই পেড়ে যৌনতার আমদানি তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক হয়েছিল। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে ধার-করা এই নতুন আমদানির কৃতিত্বকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন।

> 'বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন মূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এধরনের উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।

> কেননা 'মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই পৌরুষ।'

তিনি আরও বলেন—

> 'সাহিত্য ভালোলাগা মন্দলাগা হলো শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচার শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ-লাগাটা রুচি নিয়ে; এর উপরে আর কোনো আপিল আদালতে লোকেও অস্বীকার করতে পারে।'

৯

সাহিত্যের তাৎপর্য

■ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।'

■ 'চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।'

■ 'ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে চিত্র এবং সঙ্গীত।'

■ 'অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।'

আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসারিত হয়ে আছে। এখানে ভালমন্দ, মুখ্য ও গৌণ অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকে। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য এই জগতে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু সেই জগৎ যখন আমাদের মনে প্রবেশ করে, তখন তা রূপান্তরিত হয়। আমাদের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রভাবের স্পর্শে যা স্থূল বাস্তব তা মানসিক হয়ে ওঠে। আমাদের প্রীতি ও বিদ্বেষ, ভীতি ও বিস্ময়, সুখ ও দুঃখের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে বাইরের জগৎ এক নতুন রূপ ধারণ করে। স্বভাবতঃ আমরা জগৎকে আমাদের চেতনার স্পর্শে মানসিক ও মানবিক করে নিই।

ইংরেজ কবি এস. টি. কোলরিজ লিখেছিলেন— "O Lady, we receive but what we give, And in our life alone does nature live." যাঁদের হৃদয়বৃত্তির জারকরস পর্যাপ্ত নেই, তাঁরা জগৎকে বস্তু-সীমার বাইরে উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁদের চেতনার রঙে জগৎরূপ অহল্যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় না। জড় প্রকৃতির এমন দুই একজন লোক আছেন, যাঁদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য খুবই সীমিত। তাঁরা এই জগতে বাস করেও প্রবাসী। হৃদয়ের সংকীর্ণ জানলা দিয়ে তাঁরা বিশ্বকে দেখতে পান না। তাঁরা ভর্তৃশাপে বিড়ম্বিত। পক্ষান্তরে সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অনেক থাকেন, যাঁদের কাছে প্রকৃতির জগৎ থেমে আমন্ত্রণ আসে। এই পৃথিবীতে, 'যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি' তা তাঁদের হৃদয় বীণায় সাড়া জাগায়। প্রকৃতির অন্তরের বেদনা প্রকাশের চাঞ্চল্য তাঁদের বাঁশিতে কম্পিত মূর্ছনা সৃষ্টি করে। অতএব, ভাবুকের কাছে বাইরের জটিল ও পারম্পর্য বিচ্ছিন্ন জগৎ থেকেও হৃদয়ের অধিগত মানসিক জগতের আকর্ষণ অনেক বেশি। সংবেদনশীল মানব মন যতখানি বাইরের জগৎকে আত্মসাৎ করে নিতে পারেন, তা ঠিক ততখানি সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে।

বাইরের জগৎ নানা সুরে কথা বলে, কারণ সুন্দর ও অসুন্দর, প্রিয় ও অপ্রিয় মিলে এই প্রত্যক্ষগোচর জগৎকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে রেখেছে। একেই কবি 'Burthen of mystery' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যে জগৎ বাইরের, তা অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু যুগে যুগে কবিগণের অনুভূতি, মন মনীষার স্পর্শে, হৃদয়ের সংযোগে তা নিত্য নবীন হয়ে কাব্যে প্রতিভাত

হয়। তাই জগৎ ও জীবনের সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই যে মানস জগৎ, যা বাস্তব জগতের নব প্রকাশ ও রূপান্তর, তা বাইরে প্রকাশিত হবার আকাঙ্খা রাখে। মানসজগৎ চিরদিনই সৃষ্টি হয়ে চলেছে, কিন্তু তাকে রূপের সীমায় প্রকাশ করতে না পারলে তা হয় অকৃতার্থ। আমরা হৃদয়ে যা গভীর ভাবে অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে চাই। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে বাল্মীকি আপন হৃদয়াবেগ প্রকাশ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছিলেন। তট-অরণ্যের তলে প্রলয়নৃত্যপর মহাদেবের ডমরুধ্বনির মত কলতান সৃষ্টি করে বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রনদী যেমন নতুন করে তটভূমি রচনা করতে চায়, বাল্মীকিও সেই রকম তাঁর হৃদয়াবেগকে ভাষার সীমায় বাঁধতে চাইলেন। তাই চিরকালই সাহিত্য রচনার প্রবল আবেগ মানুষের মধ্যে অনুভূত হয়।

সাহিত্য রচনার সময় দুটি বিষয় প্রধান হয়ে ওঠে। একটি হল সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর হৃদয় দ্বারা জগৎকে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছেন; অপরটি হল, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে স্থায়ী রূপ দিতে পেরেছেন কি না। কবির কল্পনা যত সার্বভৌম হবে ততই তাঁর রচনার গভীরতা আমাদের আনন্দদান করবে। তাঁর কাব্যে বিশ্বের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে আমাদের মনকে সেখানে স্বচ্ছন্দ বিহারের সুযোগ দান করবে। রচনার নৈপুণ্যও সাহিত্যে মর্যাদা লাভ করে। এই নৈপুণ্যের ফলে কবি মনের অনুভূতি বাইরে স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। বাইরের জগৎ কবিমনে আর একটি নতুন জগতে রূপান্তরিত হয়। তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হয়, যাতে সে অন্যের হৃদয়ে অনায়াসে সঞ্চারিত হতে পারে। এই হৃদয়ের ভাব অন্যের মনে উদ্রিক্ত করার জন্য কলা-কৌশলের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। পুরুষের বেশভূষা সাধারণ ও যথাযথ হলেই চলে, কিন্তু নারীর সাজসজ্জায় সুষমা ও পারিপাট্য অপরিহার্য। তাদের আচরণে আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও সেইরকম নিজেকে সুন্দররূপে ব্যক্ত করার জন্য অলংকার, ভাষা ও ছন্দের আশ্রয় নেয়। সাহিত্যকে শুধু ব্যক্ত করলেই চলে না, রূপের মধ্যে রূপাতীতকে, বক্তব্যের মধ্যে অনির্বচনীয় তাকে প্রকাশ করতে হবে। যা রূপাতীত, অসীম ও অনির্বচনীয় তাকে নিরলংকৃত দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বাচ্যার্থের অতীত অর্থকে প্রকাশ করতে চায় বলে সাহিত্যের ভাষা ইঙ্গিতবহ বা প্রতীকধর্মী। এই যে গভীর অর্থ, যা হৃদয়বেদ্য, তাকে আলংকারিকেরা ধ্বনি বলেছেন। নারীদেহের অলংকারকে আশ্রয় করে যেমন শ্রী ও হ্রী পরিস্ফুট হয়, তেমনি ছন্দ ও অলংকারকে আশ্রয় করে সাহিত্যের অনির্বচনীয় মাধুর্য প্রকাশিত হয়। ছন্দ ও অলংকার এর উপায় মাত্র, সাহিত্যের যা অনির্বচনীয়তা তা ছন্দে ও অলংকারে আবৃত হয় না।

ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রকাশ করার জন্য সাহিত্য, চিত্র ও সঙ্গীত—এই দুই উপকরণকে গ্রহণ করে থাকে। ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করা যায় না, তা চিত্রে সহজে করা যায়। সাহিত্যের ভাবকে উপমা-রূপকের সাহায্যে গঠিত চিত্ররীতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষগোচর করা যায়। বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস লিখেছেন 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়' এর মাধ্যমে চিত্তের ব্যাকুলতা আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী'র 'পুরস্কার' কবিতায় চিত্রের মাধ্যমে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেছেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,

পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

সঙ্গীতের মাধ্যমে কাব্যের গভীর ভাব ও বচনাতীত মাধুর্যকে প্রকাশ করা যায়। সংগীতের সুরের দ্বারা ভাব-ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করা যায়। চিত্র ভাবকে রূপ দান করে ও সংগীত তার মধ্যে গতিবেগ এনে দেয়। চিত্র কাব্যের দেহ ও সংগীত তার আত্মা। বস্তুতঃ বাইরের প্রকৃতি ও মানব চরিত্র মানুষের মনে সর্বদা যে রূপ ধারণ করেছে, যে সুর সৃষ্টি করছে, ভাষায় রচিত সেই চিত্র ও গানই সাহিত্য।

M.A. 4th sem. BNG-402
Study Materials-1.67
Dr. Amar Adikari
বিষয়: সাহিত্যের তাৎপর্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা জীবনসাধনারই অঙ্গ। খণ্ডতা বা আংশিকতা নয়, সমগ্রতা সেই জীবনের ভূষণ। সত্য শিব সুন্দর তাঁর সাধক জীবনের লক্ষ্য, তাঁর শিল্পসাহিত্যেও সেই জীবনেরই প্রতিভাস। যে সৌন্দর্যবোধের মধ্যে কবিশিল্পীরা আত্মমগ্ন, বিভোর হতে ভালবাসেন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ তা থেকেও একটু স্বতন্ত্র। কেননা সে সৌন্দর্যবোধ শুধু বিশুদ্ধ নয়, তা কল্যাণ-মঙ্গলবোধের দ্বারা বিশোধিত, তা সংযম-কৃচ্ছ্রতার দ্বারা শাণিত, অতএব তা বিশুদ্ধতর, তাকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবোধ বলাই বরং ভাল। আমরা সবাই জানি, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদী ঔপনিষদিক পিতার সাহচর্য লাভ করেছিলেন বাল্যে ও কৈশোরে। পিতার অধ্যাত্মবোধ তাঁর সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং তিনি আজীবন ঔপনিষদিক ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট, তন্নিষ্ঠ এবং বিশ্বাসী ছিলেন। যত বয়স বেড়েছে তাঁর সেই ধ্যান-ধারণা তত ক্রমপরিণত হয়েছে, একমুখী এবং কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।'

উপনিষদে ভগবান রসস্বরূপ আনন্দঘন বিগ্রহ। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্তকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন অর্থাৎ জড় ও জীবন সর্বত্র তাঁর আনন্দময় সত্তার বিকাশ। জড় ও জীবন পরম একেরই লীলা। অন্যত্র তিনি (সৌন্দর্য ও সাহিত্য) বলেছেন—

> 'এজন্যই উপনিষদ বলিয়াছে : আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ।'

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর নিজের আনন্দময় সত্তাকে আস্বাদনের জন্য নিজে বহু হন। আনন্দ থেকে সর্বভূত জন্মলাভ করেছে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে তার অগ্রসৃতি, আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্তি। সত্য-শিব-সুন্দর ঈশ্বরের সেই 'আনন্দধারা (-ই) বহিছে ভুবনে'। উপনিষদের 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি সেই শ্লোকার্থের মধ্যে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

উপনিষদ থেকে আহরিত এই ধারণাটি অবশ্যই দার্শনিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ধারণা তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে আসেনি, এসেছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি হয়ে। ঈশ্বর তাঁর কাছে রসস্বরূপ। শিল্পসাহিত্য সেই রসস্বরূপ আনন্দরূপেরই প্রকাশ। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণপরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ,
> সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত।'